Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.43-47
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

উনিশ শতকে সহবাস সম্মতি আইন ও তার প্রতিক্রিয়া

শুভেন্দু মণ্ডল
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
In the 19th century, the practice of child marriage was practiced with great enthusiasm. Education was accompanied by child marriage. They were in danger as they shouldered the responsibility of the family at a young age. Motherhood at a young age harmed girls' health. It goes without saying that children born out of wedlock were in most cases weak sperm. Educated Bengali society started to become aware of the evils of early marriage like polygamy in the early nineteenth century. Especially the group of young people educated in western education did not like child marriage at all. The discussion on the harm of child marriage started in the meeting-committee. Newspapers of that time also started writing about this custom. The Cohabitation Consent Act comes in focus on the issue of child marriage. In this act intercourse with girls below 12 years of age is prohibited. At that time, some conservative people protested against this law on the grounds of religion.

Keywords: Child Marriage, Cohabitation Consent Act, Scripture, Conservative, Opposed.

বাল্যবিবাহ উনিশ শতকে জনপ্রিয় একটি প্রথা। মানুষের এমনিই ধারণা ছিল আট বছরের কন্যাকে দান করলে গৌরী দানের পুণ্য অর্জন করা হয়, নয় বছরের কন্যাকে দান করলে পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়; দশ বছরের কন্যাকে পাত্রস্থ করলে পরকালে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। ১০-১২ বছরের ছেলের সঙ্গে ৪৫ বছরের মেয়ের বিয়ে দেওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। অনেক সময় মেয়ের মুখের কথা ফোটার আগেই তাকে পাত্রস্থ করা হত। নিতান্ত অল্প বয়সে এই বিবাহের ফল যে ভাল হত না তা বলাই বাহুল্য। বাল্যবিবাহের ফলে লেখাপড়া সাঙ্গ হত। অল্প বয়সে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে পড়ায় তারা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ত। অল্প বয়সে মা হওয়ায় মেয়েদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হত। বিবাহজাত সন্তান অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বল হীনবীর্য হত তা বলাই বাহুল্য। বহুবিবাহের মত বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্পর্কে উনিশ শতকের প্রথম দিকেই শিক্ষিত বাঙালি সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণের দল বাল্যবিবাহ একেবারেই পছন্দ করত না। বাল্যবিবাহের অপকারিতা নিয়ে সভা-সমিতিতে আলোচনা শুরু হয়। সে সময়ের পত্র-পত্রিকাগুলিও এই প্রথা রদ নিয়ে নিজেদের লেখালেখি শুরু করে। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পাশাপাশি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও প্রচার চালাতে থাকেন। বাল্যবিবাহের যে সমস্ত দোষের কথা বিদ্যাসাগর বলেছিলেন তার মধ্যে পাঁচটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য-

১. বাল্যবিবাহ আমাদের দৈহিক দুর্বলতার কারণ; অপক্ক বীর্য নিষেকাদি বিভিন্ন কারণে দুর্বলতা।
২. বাল্যবিবাহ প্রথা লুপ্ত না হলে স্ত্রীশিক্ষা হবে না ফলে জনশিক্ষাও হবে না।
৩. পুরুষপক্ষে উপার্জন ক্ষমতার আগেই বিবাহ ঘটায় অর্থসংকট এবং পরমুখাপেক্ষা বাড়ে।
৪. দুষ্প্রবণতা, যা বিদ্যারত হলে জাগা সম্ভব নয়।
৫. মানুষের মৃত্যু সম্ভাবনা ১ থেকে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত বেশি। এরমধ্যে পুরুষেরা বিয়ে করলে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।[১]

বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ১৮৬০ সালে আইনের মাধ্যমে মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১০ বছর ধার্য করে ইন্ডিয়ান পিনাল কোর্টে 'এজ অফ কন্সেন্ট অ্যাক্ট' প্রবিষ্ট করানো হয়। কিন্তু শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সরকার একে আইনি রূপ দেননি। সত্তরের দশকগুলিতে এই আন্দোলনের অবস্থা পাল্টাতে শুরু করে। বাল্যবিবাহের আন্দোলনে নতুন জোয়ার আনলেন কেশবচন্দ্র সেন। 'ভারতসংস্কার সভা'র পক্ষ থেকে নতুন একটি বিবাহ বিধি প্রবর্তনের জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া হয়। কেশবচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত অনেক বাদ-প্রতিবাদের পর ১৮৭২ এ সরকার 'নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট' পাস করেন। যাকে 'ব্রাহ্মবিবাহ আইন' বা 'তিন আইন' বলা হয়। এই আইনে মেয়েদের ন্যূনতম বয়স ধার্য করা হয় চোদ্দ ও ছেলেদের আঠারো। এই আইন শুধুমাত্র ব্রাহ্মদের জন্য, এছাড়াও এই আইনে বাল্যবিবাহ ছাড়াও সর্বদ্বারী বিবাহ অনুমোদন করা হয়। একই সময়ে বাল্যবিবাহের কুফল থেকে বাঙালি সমাজকে মুক্ত করতে পূর্ব বাংলার একদল সংস্কারক তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। ঢাকায় 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' স্থাপিত হলে সভাপতি হন সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৮৭৩ এর এপ্রিল মাসে এই সভার একটি মুখপত্র প্রকাশ করা হয় এই মুখপত্রটির নাম দেওয়া হয় 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ'।

উনিশ শতকে কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রচলিত থাকার ফলে অতি অল্প বয়সের মেয়ের সঙ্গে বালক, যুবক এমনকি বৃদ্ধ ব্যক্তিরও বিয়ে হত। মেয়েদের বাল্যবিবাহ যেখানে প্রচলিত ব্যাপার, সেই সমাজের অল্প বয়সী মেয়েরা অনেক সময়েই বয়স্ক স্বামীর শারীরিক চাহিদা পূরণে বাধ্য হত। এর ফল হত মারাত্মক। উনিশ শতকে আটের দশকে পারসি ভদ্রলোক বেহেরামজি মেরনাবজি মালাবারি বাল্যবিবাহ ও বাধ্যতামূলক বৈধব্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ভারতে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেখানে তিনি হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন থাকলেও বালক বালিকাদের শরীর ও মনের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য কিছু প্রতিষেধক ব্যবস্থার কথা বলেন। যেমন যৌন অবস্থার পূর্বে বাল বধূকে পিতৃগৃহে রাখা এবং যথাসময়ে অনুষ্ঠান-পর্ব করে তাকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে আসা। সহবাসের ন্যূনতম বয়স ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ বছর রাখার কথা তিনি বলেন। সেই সময়ে বিভিন্ন সমাজ সংস্কার সমাজ সমিতির পক্ষ থেকে সহবাস সম্মতির বয়স বাড়ানোর জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়। সরকার সহবাস সম্মতির বয়স বাড়ানোর প্রস্তাবটিকে নিয়ে আলোচনা শুরু করলে চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে যায়। এ নিয়ে বাদানুবাদ চলার সময় কলকাতার বুকে ঘটে যায় এক বীভৎস ঘটনা। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফুলমণি নামে নয় বছরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় পঁয়ত্রিশ বছরের হরিমোহন মাইতির। বিয়ের কিছুদিন পরে জোর করে বালিকা বধূর সঙ্গে সহবাস করলে মৃত্যু হয় ফুলমণির। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে- "Death was caused by intercourse between a full grown man and an

immature female"।[২] এই ঘটনার প্রতিবাদে সারা বাংলা জুড়ে শুরু হয় আন্দোলন। শিক্ষিত প্রগতিশীল ব্যক্তিরা সহবাস সম্মতি আইনের জন্য সরকারকে চাপ দিতে থাকেন। সরকার বিভিন্ন মহল থেকে খোঁজখবর নিতে থাকেন, রক্ষণশীল দলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সহবাস সম্মতি আইন গৃহীত হল ১৮৯১ এর ১৮ মার্চ। এই আইনে সহবাসের বয়স ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ বছর করা হয়। এই আইনে যা বলা হয়েছে তা সে সময়ের 'সুবোধিনী' পত্রিকার ১২৯৭ ফাল্গুন সংখ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে
এই আইন অনুসারে-

১. যে কোনো পুরুষ, এমন কি দ্বাদশ বর্ষের অধিক বয়স্ক বালক পর্য্যন্তও, আপনার দ্বাদশ বছরের অল্পবয়স্কা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে, 'বলাৎকার'-অপরাধে অপরাধী হইবে।
২. ঐ স্ত্রীর যদ্যপি মাসে মাসে ঋতুস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলেও, তাহার সহিত স্বামী সহবাস করলে বলাৎকার অভিযোগে অভিযুক্ত হইবে।
৩. সহবাসে স্ত্রীর সম্মতি ছিল, অথবা স্ত্রী স্বামীকে ইহাতে উত্তেজিত করিয়াছে, স্ত্রীর সহবাস-জনিত কোন কষ্ট হয় নাই,-এই সকল প্রমাণ হইলেও, স্বামী অব্যাহতি পাইবে না।
৪. শাস্ত্রানুযায়ী, সামাজিক প্রথানুযায়ী সহবাস হইয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন হইলেও স্বামী অব্যাহতি পাইবে না।
৫. স্ত্রীর বয়ঃক্রম ১২ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া স্বামী সহবাস করিয়াছে; কিন্তু বিচারের সময় যদ্যপি উক্ত স্ত্রীর বয়ক্রম ১২ বছরের অল্প ইহা প্রমাণ হয়, তাহা হইলেও স্বামী আইনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে না।
৬.১. অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযোগ গ্রহণ করিতে হইবে।
২. পুলিশে রিপোর্ট করিলে, অভিযোগ গ্রাহ্য করিতে হইবে।
৩. অন্য লোক অভিযোগ করিলেও অভিযোগ লইতে হইবে।
৪. নিজে জানিতে পারিলে, বা সন্দেহ করিলে ম্যাজিস্ট্রেটও অভিযোগের আয়োজন করিবেন।
৭. বিচারের জন্য স্ত্রীকে আদালতে হাজির করা হইবে, এবং তাহার প্রতি যদৃচ্ছা প্রশ্ন করা হইবে।
৮. স্ত্রী যদ্যপি ১২ বছর বয়স্ক বয়ঃক্রমের অব্যহিত পরে সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে, ধরিয়া লওয়া হইবে যে, বার বছর বয়ক্রমের পুর্ব্বে তাহার সহিত সহবাস হইয়াছে; সুতরাং, ইহাতেও নালিশ চলিবে এবং স্বামীর দণ্ড হইবে।

এইরূপ সহবাস বা বলাৎকার-অপরাধের দণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।[৩]

এই আইনের খবর পাওয়ার পর রক্ষণশীল ব্যক্তিরা আইনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাদের অভিযোগ সরকার এই ধরনের আইন পাস করে হিন্দুদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। রক্ষণশীল হিন্দু নেতা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এবং শশধর তর্কচূড়ামণি এই আইনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার ভূমিকা নেন। শশধর তর্কচূড়ামণি কলকাতার রাজশক্তিকে কোনরকম ভয় না করে এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে পন্ডিতমশায়ের দৈহিক আকৃতি ও বাচনভঙ্গি কোনটাই আকর্ষণীয় ছিল না। এমনকি তার বক্তব্য বিষয়ও স্পষ্ট নয়। অথচ অফিসের ছুটির পর কর্মক্লান্ত ব্যক্তিরা ঝড় জল উপেক্ষা করে ঘন্টার পর ঘন্টা নিরবে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য শুনত। চূড়ামণি মহাশয়ের মতে "বাল্যবিবাহ দোষ নয়, কিন্তু শাস্ত্র না মানা দোষ"। তাঁর মতে বয়সকে গুরুত্ব না দিয়ে মাতৃত্ব অর্জনের ক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং শাস্ত্রের গর্ভাধান নিয়ম পালন করা উচিত। শশধর তর্কচূড়ামণির মতকেই 'বেদব্যাস' পত্রিকা বিস্তৃতভাবে লিখেছিল-

> "শাস্ত্রে বিহিত ১০ টি সংস্কারের প্রথম সংস্কারই গর্ভাধান, এই গর্ভাধান স্ত্রীর প্রথম রজদর্শনেই করিতে হয়, না করিলে এই সংস্কার মিথ্যা হইল। আর গর্ভাধান না হইলে অন্য অন্য সংস্কারের সকলটি নিস্ফল। শাস্ত্রের এই আদেশ। শাস্ত্র আরও বিধান করিয়াছেন যে রজোদর্শনে অভিগমন না করিলে নরকবাস করিতে হইবে। অতএব শাস্ত্র শুনিয়া চলিলে গর্ভাধান যথাসময়ে করিতেই হইবে। কিন্তু প্রথম রজোদর্শনের কোন নির্দিষ্ট কাল নাই। শারীরিক অবস্থা অনুসারে তাহা ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশে বিশেষ বাঙালি অনেক স্ত্রীর একাদশ বছরেই ঋতু হয়। সুতরাং তখনই গর্ভাধান করিতে হইবে"।[৪]

চূড়ামণি মশায় তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব বুদ্ধি ও বিচার শক্তি পর্যালোচনা করে নিজের কথা এমন ভাবে বলতেন যাতে শিক্ষিত মন্ডলীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হিন্দুর বিভিন্ন আচারের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন এবং 'ধর্মব্যাখ্যা' নামে একটি পুস্তকও তিনি লিখেছিলেন।

১২ বছরের কম বয়সী কোন মেয়ে ঋতু দর্শন করলেও স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে না- একথা মেনে নিতে পারলেন না অনেকেই। শাস্ত্র অবমাননার আশঙ্কায় তারা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কি ভয়ংকর ব্যাপার এর ফলে ঘটতে চলেছে তা বোঝাতে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন 'ধর্মপ্রচারক' পত্রিকায় লিখলেন-

> "যদি সমাগম সম্মতিকাল ১২শ বর্ষ স্থির হয়, আর কুলবধূ যদি তৎপূর্বেই রজঃস্বলা হয়েন, তবে গর্ভাধান সংস্কার হইতেই পারিবে না। বৈধ সংস্কার না হইলে গর্ভে যে পূত্রাদি উৎপন্ন হয়, সে সন্তানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্মের পিণ্ডদান তর্পনাদির উপযুক্ত অধিকারী হয় না"।[৫]

হিন্দু রক্ষণশীলরা মনে করতেন কন্যা রজঃস্বলা হলে গর্ভধারণ সংস্কার একান্ত অবশ্যক অথচ সরকারি আইনে বার বছরের কম বয়সী মেয়েদের সঙ্গে সহবাস করা যাবে না। এই আইনের বিরুদ্ধে অনেক পত্রিকা লেখালেখি শুরু করে। যেমন- ধর্ম প্রচারক, বেদব্যাস, অনুসন্ধান, জন্মভূমি, সুবোধিনী পত্রিকা ইত্যাদি। অন্যদিকে বাঙালি সমাজের বেশ কিছু মানুষ আইনটির সমর্থনে এগিয়ে আসেন। পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে সঞ্জীবনী, সহচর, নব্যভারত এই আইনের পক্ষে মতামত প্রকাশ করে। জন্মভূমি, মাঘ ১৩৯৭ সংখ্যায় বলা হয়েছে-

> "এইরূপ আইন প্রকাশিত হইলে হিন্দুর প্রতি অতি গুরুতর আঘাত করা হইবে। হিন্দুর সমস্ত ধর্ম শাস্ত্রের গতি অবরোধ হইবে, গর্ভাধান নামে একটি শাস্ত্রবিহিত ধর্ম কার্য আছে, তাহার বাধা দান করা হইবে"।[৬]

মুসলিমরাও এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। তাদের বক্তব্য এই বিলটি পাস হলে ১২ বছরের কম বয়স্ক স্ত্রীরা রজস্বলা হলেও যতদিন না স্বামী সহবাসের উপযুক্ত হচ্ছে (ইসলামের ভাষায় কবিল ওয়াতি সবিবা) ততদিন পর্যন্ত স্বামীর কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভরণপোষণের দাবি করতে পারবে না। অভিভাবকের ওপর এ বোঝা চাপানো এবং তার ব্যক্তিগত ক্ষতি উভয়ই ইসলাম ধর্মবিরোধী। ইতিমধ্যে বিধবা বা স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্ত হলে সম্পূর্ণ ভরণপোষণ দাবি করাও কখনো সম্ভব হবে না। ধর্মের অনুশাসন সম্পূর্ণ না মেনে স্ত্রীর সম্পূর্ণ ভরণপোষণ বহনে স্বামীকে বাধ্য করলে তা ধর্মে হস্তান্তর করা হবে। এসব কারণ দেখিয়ে 'রইস এন্ড রায়ত' পত্রিকায় জনৈক মুসলমান এ আইনের প্রতিবাদ করেন।[৭]

এই বিলটির সরকারি পর্যায়ে আলোচনার সময় স্যার এড্রুজ স্কোবল বিলটি সমর্থন করে বলেন, এ বিল পাস হলে,

১. নারীসমাজকে অপরিণতাবস্থায় বেশ্যাবৃত্তি থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে,
২. উপযুক্ত বয়সের পূর্বে সহবাস থেকে মেয়েদেরকে রক্ষা করা যাবে।[৮]

যাই হোক এই বিলটি নিয়ে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন ফেলেছিল। সমগ্র বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এই আইনটি কার্যকর হয়েছিল। তবে শিক্ষা প্রসারে সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছিল। তাই পরবর্তী সময়ে এই আইন নিয়ে ততটা আলোচনা ও সমালোচনা হয়নি।

তথ্যসূত্র:

১. রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৮৫০-১৯০০), কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা- ৬৪
২. স্বপন বসু (সম্পাদিত), সংবাদ সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩। পৃষ্ঠা- ৪৭
৩. তদেব। পৃষ্ঠা- ২২০
৪. 'বেদব্যাস', মাঘ, ১২৯৭
৫. পুলক চন্দ(সম্পাদিত), নারীবিশ্ব, কলকাতা: গাংচিল, ২০০৮। পৃষ্ঠা- ৬৬
৬. স্বপন বসু (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা- ২১৬
৭. রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা- ৮২
৮. তদেব। পৃষ্ঠা- ৭৭